সূরা আত তাওবাঃ রুকুঃ ৪র্থ আয়াত সংখ্যাঃ (২৫-২৯)

أَعُوذُ بِاللَّ مِنُ الشّيْطَانُ الرّجِيمُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ ৯ : ২৫
شَيْئًا وَّ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ

২৫. অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য হওয়া; কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও যমীন তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। তারপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েছিলে।

দায়িত্ব মুক্তি ও সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা সম্বলিত ভয়ংকর নীতি কার্যকর করার ফলে সারা আরবে সর্বত্র যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে এবং তার মোকাবিলা করা অসম্ভব হবে বলে যারা আশঙ্কা করছিল তাদেরকে বলা হচ্ছে, এসব অমূলক ভয়ে ভীত হচ্ছো কেন? এর চাইতেও বেশী কঠিন বিপদের সময় যে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন তিনি এখনো তোমাদের সাহায্য করার জন্য রয়েছেন। এ কাজ যদি তোমাদের শক্তির ওপর নির্ভর করতো তাহলে এর আর মক্কা সীমানা পার হতে হতো না। আর না হোক, বদরের ময়দানেতো খতমই হয়ে যেতো। কিন্তু এর পেছনে তো রয়েছে স্বয়ং আল্লাহর শক্তি। আর অতীতের অভিজ্ঞতাসমূহ তোমার কাছে একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এখনো পর্যন্ত আল্লাহর শক্তিই এর উন্নতি ও বিকাশ সাধন করে এসেছে। কাজেই নিশ্চিত বিশ্বাস রাখো, আজো তিনিই একে উন্নতি ও অগ্রগতি দান করবেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় হুনাইন যুদ্ধের কথা। কারণ, সে যুদ্ধে এমন সব ধারণাতীত অদ্ভুত ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে, যেগুলো নিয়ে চিন্তা করলে মানুষের ঈমানী শক্তি প্রবল ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়।

মক্কা ও তায়েফের মধ্যস্থলে একটি উপত্যকার নাম হুনাইন। যা মক্কা শরীফ থেকে পূর্ব দিকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি অনেকটা আরাফার দিকে। বর্তমানে এ স্থানকে ‘আশ-শারায়ে’ বলা হয়। [আতেক গাইস আল-বিলাদী, মুজামুল মা’আলিমিল জুগরাফিয়্যাহ ১০৭]

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে যখন মক্কা বিজিত হয় আর মক্কার কুরাইশগণ অস্ত্র সমর্পণ করে, তখন আরবের বিখ্যাত ধনী ও যুদ্ধবাজ হাওয়াযেন গোত্র-যার একটি শাখা তায়েফের বনূ-সকীফ নামে পরিচিত, তাদের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে তারা একত্রিত হয়ে আশংকা

প্রকাশ করতে থাকে যে, মক্কা বিজয়ের পর মুসলিমদের বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, তখন পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্য হবে তায়েফ। তাই তাদের আগে আমাদের আক্রমণ পরিচালনা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এখানে হাওয়াযিন এবং সাকীফ দুই গোত্রের লোকেরা তীর নিক্ষেপ কাজে বড় পটু বলে প্রসিদ্ধি ছিল। এরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সে কথা রসূল (সাঃ) জানতে পারলে ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে সেই গোত্র দু' টির সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে 'হুনাইন উপত্যকায় উপস্থিত হলেন। এই যুদ্ধ মক্কা বিজয়ের ১৮/১৯ দিন পর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়.

পরামর্শ মত এ উদ্দেশ্যে হাওয়াযেন গোত্র মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত শাখা-গোত্রগুলোকে একত্রিত করে। আর বিশাল সে গোত্রের প্রায় সবাই যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়।

এ অভিযানের নেতা ছিলেন মালেক ইবন আউফ। অবশ্য পরে তিনি মুসলিম হয়ে ইসলামের অন্যতম ঝাণ্ডাবাহী হন। তবে প্রথমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তীব্র প্রেরণা ছিল তার মনে। তাই স্বগোত্রের সংখ্যাগুরু অংশ তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ গোত্রের অপর দুটি ছোট শাখা- বনু-কা' ব ও বনু-কেলাব মতানৈক্য প্রকাশ করে। আল্লাহ তাদের কিছু দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। তারা বলতে থাকে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়াও যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, তথাপি তিনি সকলের উপর জয়ী হবেন, আমরা আল্লাহর শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে পারব না।

এই দুই গোত্র ছাড়া বাকী সবাই যুদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। সেনানায়ক মালেক ইবন আউফ পূর্ণ শক্তির সাথে রণাঙ্গনে তাদের সুদৃঢ় রাখার জন্য এ কৌশল অবলম্বন করেন যে, যুদ্ধেক্ষেত্রে সকলের পরিবার-পরিজনও উপস্থিত থাকবে এবং প্রত্যেকের জীবিকার প্রধান সহায় পশুপালও সাথে রাখতে হবে। উদ্দেশ্য, কেউ যেন পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের টানে রণক্ষেত্র ত্যাগ না করে। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। হাফেযুল-হাদীস আল্লামা ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ চব্বিশ বা আটাশ হাজারের সংখ্যাকে সঠিক মনে করেন। আর কেউ কেউ বলেনঃ এদের সংখ্যা চার হাজার ছিল। তবে এও হতে পারে যে, পরিবার-পরিজনসহ ছিল তারা চব্বিশ বা আটাশ হাজার, আর যোদ্ধা ছিল চার হাজার।

মোটকথা, এদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফেই অবহিত হন এবং তিনিও এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প নেন। মক্কায় আত্তাব ইবন আসাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমীর নিয়োগ করেন এবং মুআয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লোকদের ইসলামী তা' লীম দানের জন্য তার সাথে রাখেন। তারপর মক্কার কুরাইশদের থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ধারস্বরূপ সংগ্রহ করেন। ইমাম যুহরীর বর্ণনামতে চৌদ্দ হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এতে ছিলেন মদীনার বার হাজার আনসার যারা মক্কা বিজয়ের জন্য তার সাথে এসেছিলেন। বাকী দু'হাজার ছিলেন আশপাশের অধিবাসী, যারা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলিম হয়েছিলেন এবং যাদের বলা হত 'তোলাকা' অর্থাৎ সাধারণ ক্ষমায় মুক্তিপ্রাপ্ত। ৮ম হিজরীর ৬ই শাওয়াল শুক্রবার রাসূলের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাদলের যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল আমাদের অবস্থান হবে খায়ফে বনী-কেনানার সে স্থানে, যেখানে মক্কার কুরাইশগণ ইতিপূর্বে মুসলিমদের সাথে সামাজিক বয়কটের চুক্তিপত্র সই করেছিল।

চৌদ্দ হাজারের এ বিরাট সেনাদল জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে তাদের সাথে মক্কার অসংখ্য নারী-পুরুষও যুদ্ধের দৃশ্য উপভোগের জন্যে বের হয়ে আসে। তাদের সাধারণ মনোভাব ছিল, এ যুদ্ধে মুসলিম সেনারা হেরে গেলে আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেয়ার একটা ভাল সুযোগ হবে। আর যদি তারা জয়ী হয়ে যায় তা হলেও আমাদের ক্ষতি নেই। সে যা হোক, মুসলিম সেনা দল হুনাইন নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। এ সময় সুহাইল ইবন হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ জনৈক অশ্বারোহী এসে শত্রুদলের সংবাদ দিয়েছে যে, তারা পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদসহ রণাঙ্গনে জমায়েত হয়েছে। স্মিতহাস্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ চিন্তা করো না, ওদের সবকিছু গনীমতের মাল হিসাবে মুসলিমদের হস্তগত হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনে অবস্থান নিয়ে আব্দুল্লাহ ইবন হাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গোয়েন্দারূপে পাঠান। তিনি দুদিন তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের সকল যুদ্ধ প্রস্তুতি অবলোকন করেন। এক সময় শত্রু সেনানায়ক মালেক ইবনে আউফকে স্বীয় লোকদের একথা বলতে শোনেনঃ মুহাম্মাদ এখনো কোন সাহসী যুদ্ধবাজদের পাল্লায় পড়েনি। মক্কার নিরীহ কুরাইশদের দমন করে তিনি বেশ দাম্ভিক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারবে কার সাথে তার মোকাবেলা। আমরা তার সকল দম্ভ চূর্ণ করে দেব তোমরা কাল ভোরেই রণাঙ্গনে এরূপ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে যে, প্রত্যেকের পেছনে তার স্ত্রী-পরিজন ও মালামাল উপস্থিত থাকবে। তরবারীর কোষ ভেঙ্গে ফেলবে এবং সকলে একসাথে আক্রমণ করবে। বস্তুতঃ কাফেরদের ছিল প্রচুর যুদ্ধ অভিজ্ঞতা। তাই তারা বিভিন্ন ঘাঁটিতে কয়েকটি সেনাদল লুকায়িত রেখে দেয়।

এ হল শত্রুদের রণপ্রস্তুতির একটি চিত্র। কিন্তু অন্যদিকে এক হিসাবে এটি ছিল মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ যাতে অংশ নিয়েছে চৌদ্দ হাজারের এক বিরাট বাহিনী। এ ছাড়া অস্ত্রশস্ত্রও ছিল আগের তুলনায় প্রচুর। তাই কারো কারো মন থেকে বের হয়ে আসেঃ আজকের জয় অনিবার্য, পরাজয়

অসম্ভব। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাতেই শত্রুদল পালাতে বাধ্য হবে। কিন্তু মুসলিমরা আল্লাহর উপর ভরসা না করে জনবলের উপর তৃপ্ত থাকবে এটা আল্লাহর পছন্দ ছিল না। এটাই হুনাইনের যুদ্ধে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। হাওয়াযেন গোত্র পূর্ব পরিকল্পনা মতে মুসলিমদের প্রতি সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনা করে। একই সাথে বিভিন্ন ঘাঁটিতে লুকায়িত কাফের সেনারা চতুর্দিক থেকে মুসলিমদের ঘিরে ফেলে। এ সময় আবার ধূলি-ঝড় উঠে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে। এতে সাহাবাগণের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হলো না। ফলে তারা পিছু হটতে শুরু করেন।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের দিকে বাড়তে থাকেন। তার সাথে ছিলেন অল্প সংখ্যক সাহাবী। এরাও চাচ্ছিলেন যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর না হন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেনঃ উচ্চঃস্বরে ডাক দাও, বৃক্ষের নীচে জিহাদের বাই' আত গ্রহণকারী সাহাবীগণ কোথায়? সূরা বাকারাওয়ালারা কোথায়? জান কুরবানের প্রতিশ্রুতিদানকারী আনসারগণই বা কোথায়? সবাই ফিরে এস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেই আছেন।

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ আওয়ায রণাঙ্গনকে প্রকম্পিত করে তোলে। পলায়নরত সাহাবীগণ ফিরে দাঁড়ান এবং প্রবল সাহসিকতার সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে চলেন। ঠিক এ সময় আল্লাহ এদের সাহায্যে ফেরেশতাদল পাঠিয়ে দেন। এরপর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। কাফের সেনানায়ক মালেক ইবন আউফ পরিবার-পরিজন ও মালামালের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং তায়েফ দূর্গে আত্মগোপন করে। এরপর গোটা শত্রুদল পালাতে শুরু করে। যুদ্ধ শেষে মুসলিমদের হাতে আসে তাদের সকল মালামাল, ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চব্বিশ হাজার উট, চব্বিশ হাজার ছাগল এবং চার হাজার উকিয়া রৌপ্য। [কুরতুবী; বাগভী; ইবন কাসীর প্রমূখ। বিস্তারিত জানার জন্য আরও দেখুন, ইবরাহীম ইবন ইবরাহীম কুরাইবী কৃত মারওয়িয়াতু গাযওয়াতি হুনাইন ওয়া হিসারুত তায়িফ]

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, আবু আবদির রহমান ফাহরী, যার নাম ইয়াযীদ ইবনে উসাইদ অথবা ইয়াযীদ ইবনে আনীস এবং যাকে কুরও বলা হয়, তিনি বলেন, আমি এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত গরম । দুপুরের সময় আমরা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করি। সূর্য পশ্চিমে চলে যাওয়ার পর আমি আমার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হই এবং ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তাঁবুতে পৌছি। সালামের পর আমি তাঁকে বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এখন বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ, ঠিক আছে।" অতঃপর তিনি ডাক দেনঃ "বিলাল!" ঐ সময় বিলাল (রাঃ) একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ডাক শোনা মাত্রই (আরবী) এ কথা বলতে বলতে তিনি হাযির হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ

(সঃ) তাকে বলেনঃ ‘‘আমার সওয়ারী ঠিক কর।" তখনই তিনি তার ঘোড়ার জিন কষে দেন, যার পাল্লা দু’ টি ছিল খেজুর পাতার রজ্জু। সেখানে ছিল না কোন গর্ব ও অহংকারের বস্তু! জিন কষা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোড়ার উপর আরোহণ করেন। আমরা কাতারবন্দী হয়ে যাই। সন্ধ্যা ও রাত্রি এভাবেই কেটে যায়। অতঃপর উভয় সৈন্যদল মুখোমুখী হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে মুসলিমরা পালাতে শুরু করেন, যেমন আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সবাইকে ডাক দিয়ে বলেনঃ ‘‘হে আল্লাহর বান্দারা! আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হে মুহাজির দল! আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।” এরপর তিনি ঘোড়া হতে অবতরণ করেন এবং এক মুষ্টি মাটি নিয়ে বলেনঃ ‘‘এটা যেন তাদের চেহারায় পতিত হয়।” এ কথা বলে তিনি ঐ মাটি কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করেন। এতেই মহান আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করেন। ঐ মুশরিকরাই বর্ণনা করেছে- ‘‘আমাদের মধ্যে এমন কেউই বাকী ছিল না যার চোখে ও মুখে এ মাটি পড়েনি। ঐ সময় আমাদের মনে হচ্ছিল যেন যমীন ও আসমানের মাঝে কোন লোহার থালায় লোহা পতিত হচ্ছে।” (এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম হাফিয বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন)

() অর্থাৎ তোমরা সংখ্যাধিক্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলে, কারণ তারা সংখ্যায় ছিল বার হাজার, মতান্তরে ষোল হাজার। [কুরতুবী] এটা নিঃসন্দেহে এক বিরাট বাহিনী। তাদের কেউ কেউ বলেও বসল যে, আমরা আজ সংখ্যায় স্বল্পতার কারণে পরাজিত হব না। কিন্তু পরাজিত তাদের হতেই হলো, সে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কাজে আসল না। প্রশস্ত হওয়া সত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল। তারপর তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলিমরা সংখ্যাধিক্যে কখনও জয়লাভ করে না। তারা জয়লাভ করে আল্লাহর সাহায্যে। [কুরতুবী]।এরপর আল্লাহ তার রাসূল এবং তোমাদের উপর তাঁর সাকীনাহ বা প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং ফেরেশতাদের এমন সৈন্যদল প্রেরণ করেন যাদের তোমরা দেখনি। তারপর তোমাদের হাতে কাফেরদেরকে শাস্তি দিলেন।

<u>সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে</u>, তাকে একটি লোক বলেনঃ ‘‘হে আবূ আম্মারাহ (রাঃ)! আপনারা কি হুনায়েনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন?’’ উত্তরে তিনি বলেনঃ ‘‘(এ কথা সত্য বটে) কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পা মুবারক একটুও পিছনে সরেনি। ব্যাপার ছিল এই যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা তীরন্দাজীতে উস্তাদ ছিল। আল্লাহর ফযলে আমরা প্রথম আক্রমণেই তাদেরকে পরাস্ত করে দেই। কিন্তু লোকেরা যখন গনীমতের মালের উপর ঝুঁকে পড়ে তখন হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা সুযোগ বুঝে পুনরায় তীর বর্ষণ শুরু করে দেয়। ফলে মুসলিমদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে

যায়। সুবহানাল্লাহ! সেদিন দেখেছি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পূর্ণ সাহস ও বীরত্বপণা! মুসলিম সৈন্যেরা পলায়ন করেছে। তিনি এমন কোন দ্রুতগামী সওয়ারীর আরোহী ছিলেন না যে, সেটা দৌড়িয়ে পালাতে কাজে আসবে। বরং তিনি একটি খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন এবং মুশরিকদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি নিজেকে গোপন করে রাখেননি। বরং নিজের নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করতে করতে চলছিলেন। যেন তাকে যারা চিনে না তারাও চিনতে পারে । চিন্তা করে দেখুন যে, একক সত্তার উপর তার কি পরিমাণ ভরসা! আর আল্লাহ তাআলার সাহায্যের উপর তার কত পূর্ণ বিশ্বাস! তিনি জানতেন যে, আল্লাহ তাআলা রিসালাতের ব্যাপারটাকে অবশ্যই পূর্ণ করবেন এবং তার দ্বীনকে দুনিয়ার সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করে রাখবেন। সুতরাং সদা সর্বদা তার উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক!

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘‘আমাকে ‘রুব’ বা ভক্তিযুক্ত ভয় দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে এবং আমাকে সমুদয় কালেমা প্রদান করা হয়েছে।

وَمَنۡ اَعۡرَضَ عَنۡ ذِكۡرِىۡ فَاِنَّ لَـهٗ مَعِيۡشَةً ضَنۡكًا وَّنَحۡشُرُهٗ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ اَعۡمٰى ١٢٤

আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ আর তাকে কিয়ামাতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সূরা তাহাঃ ১২৪

কুরআনের ভাষ্যে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য সংকীর্ণ ও তিক্ত জীবনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যারা আল্লাহর কুরআন ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলতে বিমুখ হয়। কিন্তু কোথায় তাদের সে সংকীর্ণ ও তিক্ত জীবন হবে তা নির্ধারণে বেশ কয়েকটি মত রয়েছেঃ

এক) তাদের দুনিয়ার জীবন সংকীর্ণ হবে। তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেয়া হবে। যা তাদের জীবনকে অতিষ্ট করে তুলবে। ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পাদই সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদা-সর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশঙ্কা তাদেরকে অস্থির করে তুলবে। কেননা, সুখ-শান্তি অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততার মাধ্যমেই অর্জিত হয়; শুধু প্রাচুর্যে নয়। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

দুই) অনেক মুফাসসিরের মতে এখানে সংকীর্ণ জীবন বলতে কবরের জীবনকে বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ তাদের কবর তাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে যাবে বিভিন্ন প্রকার শাস্তির মাধ্যমে। এতে করে কবরে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে দেয়া হবে। তাদের বাসস্থান কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এক হাদীসে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং مَعِيْشَةً ضَنْكًا -এর তাফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগত ও সেখানকার আযাব বোঝানো হয়েছে। [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৩৮১ নং-৩৪৩৯, ইবনে হিব্বানঃ ৭/৩৮৮, ৩৮৯ নং-

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন, 'আল্লাহ তা 'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার অন্তরকে অভাব-মুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে দিব। আর যদি তা না কর, তবে আমি তোমার হাতকে (দুনিয়ার) ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব মিটাবো না' (আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৭২)।

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴾ ৯ : ২৬

২৬. তারপর আল্লাহ তার নিকট হতে তাঁর রাসূলের উপর ও মুমিনদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী নাযিল করলেন যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর তিনি কাফেরদেরকে শাস্তি দিলেন; আর এটাই কাফেরদের প্রতিফল।

সাকীনা سَكِيْنَةٌ আরবী ভাষায় স্থিরতা, প্রশান্তি ও দৃঢ় চিত্ততাকে বুঝায়।

এই ২৬ নং আয়াতটি আয়াতুস সাকীনার অন্তর্ভূক্ত। সেই আয়াতগুলোতে দেখা যাক--- ৬টি আয়াত, সূরা বাকারাঃ ২৪৮,সূরা তাওবাঃ২৬,৪০,সূরা ফাতহঃ ৪,১৮,২৬

যেকোন নাজুক মুহূর্তে রসূলের সা নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শন সম্পর্কে, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে এবং নিজেদের আদর্শিক কর্ম-তৎপরতার ন্যায় ও সত্য হওয়া সম্পর্কে মুসলমানদের মনে যে পূর্ণ আস্থা ও প্রশান্তি ছিল তা সরাসরি আল্লাহর মেহেরবানী। এ কারণে তারা ধীর স্থীর মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে যাই ঘটুক না কেন তা সবই শিরধার্য। এ কারণে সাহাবা রা. ভয়-ভীতি, অস্থিরতা, উস্কানী এবং নৈরাশ্য সবকিছু থেকে মুক্ত ছিলেন। এর কল্যাণেই তাঁদের পূর্ণ শৃংখলা ও সংযম বজায় ছিল। এটাই সেই প্রশান্তি যা আল্লাহ তা' আলা মু' মিনদের মনে নাযিল করেছিলেন।

সাকীনা পাওয়ার অন্যতম শর্ত হলো মহান রবের উপরপূর্ণ ঈমান, আস্থা, নির্ভরশীলতা রাখা। সাহাবা আযমাইন রা.দের জীবনে যত পরীক্ষা এসেছে তার প্রত্যেকটিতে নিষ্ঠা, তাকওয়া ও আনুগত্যের নীতির ওপর দৃঢ়পদ থেকেছেন। ঈমান কোন স্থির, জড় ও অপরিবর্তনীয় অবস্থার নাম নয়। বরং ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি ও ওঠানামা আছে। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে মুমিনদের

জীবনের পদে পদে এমন সব পরীক্ষা আসে, যখন তাকে এ সিদ্ধান্তকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় যে, আল্লাহর দীনের জন্য সে জাল -মাল আবেগ-অনুভূতি, আশা -আকাংখা, সময়, আরাম আয়েশ এবং স্বার্থ কুরবানী করতে প্রস্তুত আছে কিনা! যদি মুমিন প্রস্তুত থাকে তখনই সাকীনা নাযিল হয় ও সাথে সাথে ঈমানও বেড়ে যায়।

ইবনুল কাইয়্যিমের বর্ননা-

চারিদিকের পরিস্থিতি যখন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে যেতো তখন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ "আয়াতুস সাকীনাহ" তিলাওয়াত করতেন। আমি তার কাছ থেকে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনেছি। তিনি সেইবার বেশ অসুস্থ ছিলেন। এই নাজুক মুহুর্তেও তার শত্রুরুপ কিছু নাপাক আত্মারা তার ক্ষতি করতে পিছু হটেনি। সেই মুহুর্তের বর্ণনা সাধারন মানুষের জন্যে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিলোনা। তিনি(শাইখুল ইসলাম) বলেন, আমি যখন এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করলাম, তখন আশেপাশের লোকদের "আয়াতুস সাকীনাহ" গুলো তিলাওয়াত করতে বললাম। ফলশ্রুতিতে আমি আমার জটিলতা থেকে মুক্তি পেলাম। আমার অনুভূতি এমন হয়ে গেলো যে, আমার জীবনে যেন কোনো সমস্যাই নেই। এক অদ্ভত পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করলাম। আমি নিজেও তা আমলের চেষ্টা করেছি। অন্তর যখন সংকুচিত হয়ে আসে তখন এই "আয়াতুস সাকীনাহ" গুলো পড়তে থাকি। আর আয়াতগুলো ও তার জাদুকরী প্রভাব ফেলে। ফলে আমি অন্তরে প্রশান্তির ছোঁয়া পেতাম।

[কথাগুলো ইবনুল কাইয়্যিমের (মাদারিজুস সালিকীন, ২/৫০২) থেকে নেওয়া। এক ইংলিশ আর্টিকেল থেকে অনূদিত।]

এ বাক্যের অর্থ হলো, হুনাইনের যুদ্ধে প্রথম আক্রমণে যে সকল সাহাবী আপন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোবল ফিরে পাবার পর স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে আসেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মুমিনদের ব্যাপারে প্রশান্তি লাভ করলেন। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহর প্রশান্তি ছিল দু'প্রকার।

এক প্রকার পলায়নরত সাহাবীদের জন্য, অন্য প্রকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের। এ কথার ইঙ্গিত দানের জন্য على বা উপর শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছেঃ "অতঃপর আল্লাহ প্রশান্তি নাযিল করলেন তাঁর রাসূলের উপর এবং মুমিনদের উপর।" সাহাবাদের প্রতি প্রশান্তি প্রেরণের অর্থ হলো, তারা ভয়-ভীতির পরে সাহসিকতা ও দৃঢ়তার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এর উপর প্রশান্তি নাযিল হওয়ার অর্থ মুসলিমদের ব্যাপারে তার মনে প্রশান্তি নাযিল হওয়া এবং বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

() তারা ছিল ফেরেশতা। তাদের কাজ ছিল মুমিনদের পদযুগলে দৃঢ়তা স্থাপন আর কাফেরদের মনে ভয়-ভীতি উদ্রেককরণ। [সা' দী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এখানে বলা হয়েছে যে, তারা তাদেরকে দেখেনি। মূলত: এটা হলো সাধারণ লোকদের ব্যাপারে, তাই কেউ কেউ তাদেরকে মানুষের রুপে দেখেছেন বলে যে কতিপয় বর্ণনায় এসেছে, তা উপরোক্ত উক্তির বিরোধী নয়।

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ৯ : ২৭

২৭. এরপরও যার প্রতি ইচ্ছে আল্লাহ তার তাওবাহ কবুল করবেন; আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, যারা মুসলিমদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়ার শাস্তি পেয়েছে এবং কুফরী আদর্শের উপর অটল রয়েছে, তাদের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ ঈমানের তাওফীক দেবেন। বাস্তবেও পরাজিত হাওয়াযেন ও সকীফ গোত্রদ্বয়ের অনেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদান্যতা ও ভদ্র ব্যবহার দেখে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ফেরৎ পেয়েছিল। [সা' দী] আর আল্লাহ প্রশস্ত রহমতের অধিকারী। তাঁর রহমত সর্বব্যাপী। তাওবাহকারীদের বড় গোনাহও ক্ষমা করে দেন। আর তাদেরকে তাওবাহ করার তাওফীক দেন, তাদের অপরাধসমূহ মার্জনা করেন, সুতরাং বান্দা যত অন্যায়ই করুক না কেন তাঁর রহমত থেকে যেন সে নিরাশ না হয়। [সা'দী]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ৯ : ২৮
وَ اِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ؕ

২৮. হে ঈমানদারগণ মুশরিকরা তো অপবিত্র; কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের ধারে-কাছে না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর তবে আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

অংশীবাদী বা মুশরিকরা অপবিত্র কথার অর্থ হল, আকীদা-বিশ্বাস ও আমল হিসাবে তারা (অভ্যন্তরীণভাবে) অপবিত্র। কারো কারো নিকটে মুশরিক বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয়ভাবে অপবিত্র। কেননা, তারা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সেইরূপ খেয়াল রাখে না, যেরূপ শরীয়ত নির্দেশ করেছে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র দ্বীনের অনুসারী এবং পাক পবিত্র মুসলিম বান্দাদেরকে হুকুম করছেন যে, তারা যেন ধর্মের দিক থেকে অপবিত্র মুশরিকদেরকে বায়তুল্লাহর পাশে আসতে না দেয়। এই আয়াতটি নবম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। ঐ বছরই রাসূলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ)-কে আবু বকর (রাঃ) -এর সাথে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেনঃ ''হজ্বের সমাবেশে ঘোষণা করে দাও যে, এ বছরের পরে কোন মুশরিক যেন হজ্ব করতে না আসে এবং কেউ যেন উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করে। শরীয়তের এই হুকুমকে আল্লাহ তা'আলা এমনিতেই পূর্ণ করে দেন। সেখানে আর মুশরিকদের প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য হয়নি এবং এরপরে উলঙ্গ অবস্থায় কেউ আল্লাহর ঘরের তাওয়াফও করেনি। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) গোলাম ও যিম্মী ব্যক্তিকে এই হুকুমের বহির্ভূত বলেছেন। মুসনাদে আহমাদে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''এ বছরের পরে চুক্তিকৃতগণ ছাড়া এবং তাদের গোলামরা ছাড়া আর কেউই যেন আমাদের মসজিদে প্রবেশ না করে। কিন্তু এই মারফু হাদীস অপেক্ষা বেশী সহীহ সনদযুক্ত মাওকুফ রিওয়ায়াত রয়েছে।মুসলিমদের খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) ফরমান জারী করেছিলেনঃ ''ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে মুসলমানদের মসজিদে আসতে দিবে না।" এই আয়াতকে কেন্দ্র করেই তিনি এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন।

এ বছর বলতে অধিকাংশ মুফাসসিরীনদের মতে ৯ম হিজরী বুঝানো হয়েছে। কাতাদা বলেন, এটা ছিল সে বছর যে বছর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের নিয়ে হজ করেছেন। তখন আলী এ বিষয়টির ঘোষণা লোকদের মধ্যে দিয়েছিলেন। তখন হিজরতের পর নবম বছর পার হচ্ছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরবর্তী বছর হজ করেছিলেন। তিনি এর আগেও হজ করেননি, পরেও করেননি। [তাবারী]

() এখানে ''মাসজিদুল হারাম'' বলতে সাধারণতঃ বুঝায় বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকের আঙ্গিনাকে যা দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তবে কুরআন ও সুন্নার কোন কোন স্থানে তা মক্কার পূর্ণ হারাম শরীফ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যা কয়েক বর্গমাইল এলাকব্যাপী। যার সীমানা চিহ্নিত করেছেন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম। যেমন, মে'রাজের ঘটনায় মাসজিদুল হারামের উল্লেখ রয়েছে। ইমামগণের ঐক্যমতে এখানে ''মাসজিদুল হারাম'' অর্থ বায়তুল্লাহর আঙ্গিনা নয়। কারণ, মে'রাজের শুরু হয় উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘর থেকে, যা বায়তুল্লাহর আঙ্গিনার বাইরে। অনুরূপ সূরা তাওবার শুরুতে ৭ নং আয়াতে যে মসজিদুল হারামের উল্লেখ রয়েছে, তার অর্থও পূর্ণ হারাম শরীফ। কারণ, এখানে উল্লেখিত সন্ধির স্থান হলো 'হুদায়বিয়া' যা হারাম শরীফের সীমানার বাইরে তার অতি সন্নিকটে অবস্থিত। [আল-বালাদুল হারাম: আহকাম ওয়া আদাব]

() ইবনে আব্বাস বলেন, যখন আল্লাহ্ তা' আলা মুশরিকদের মাসজিদুল হারামে যাওয়া থেকে নিষেধ করলেন, তখন শয়তান মুমিনদের অন্তরে চিন্তার উদ্রেক ঘটাল যে, তারা কোত্থেকে খাবে? মুশরিকদেরকে তো বের করে দেয়া হয়েছে, তাদের বানিজ্য কাফেলা তো আর আসবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন। যাতে তিনি তাদেরকে আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। আর এর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দিলেন। [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ لَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ ٢٩ : ٩

২৯. যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহতে ঈমান আনে না এবং শেষ দিনেও নয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না, আর সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে নিজ হাতে জিযইয়া দেয়।

যদিও আহলি কিতাবরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখার দাবীদার কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, না আখেরাতের প্রতি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ আছে একথা মেনে নেয়া নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ও একমাত্র রব বলে মেনে নেবে এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতায় নিজেকে বা অন্য কাউকে শরীক করবেনা। কিন্তু খৃস্টান ও ইহুদীরা এ অপরাধে লিপ্ত। পরবর্তী পর্যায়ের আয়াতগুলোতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই তাদের আল্লাহকে মেনে নেয়ার কথাটা অর্থহীন। একে কোন ক্রমেই ঈমান বিল্লাহ বলা যেতে পারে না। অনুরূপভাবে আখেরাতকে মানার অর্থ মরে যাওয়ার পর আমাদের আবার উঠানো হবে, শুধু এতটুকু কথার স্বীকৃতি দেয়া নয় বরং এ সঙ্গে এ কথা মেনে নেয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, সেখানে কোন চেষ্টা-তদবীর ও সুপারিশ করা, জরিমানা দেয়া এবং কোন বুজর্গ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ও বন্ধন কোন কাজে লাগবে না। কেউ কারোর পাপের কাফফারা হবে না। আল্লাহর আদালতে ইনসাফ হবে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন এবং মানুষের ঈমান ও আমল ছাড়া আর কোন জিনিসকে মোটেই মূল্য দেয়া হবে না। এরূপ বিশ্বাস ছাড়া আখেরাতকে মেনে নেয়া অর্থহীন। কিন্তু ইহুদী ও খৃস্টানরা এ দিক দিয়েই নিজেদের ঈমান আকিদা নষ্ট করে ফেলেছে। কাজেই তাদের আখেরাতের প্রতি ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ তার রসূলের মাধ্যমে যে শরীয়াত নাযিল করেছেন তাকে নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না।

তারা ঈমান আনবে ও আল্লাহর সত্য দ্বীনের অনুসারী হয়ে যাবে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তা নয়। বরং যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছেঃ তাদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য খতম হয়ে যাবে। তারা পৃথিবীতে শাসন ও কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। বরং পৃথিবীতে মানুষের জীবন ব্যবস্থা লাগাম এবং মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করা ও তাদের নেতৃত্ব দান করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সত্যের অনুসারীদের হাতে থাকবে এবং তারা এ সত্যের অনুসারীদের অধীনে অনুগত জীবন যাপন করবে।

- যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে বলে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এসেছে তারা হলোঃ ইয়াহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়। আল্লাহ তা'আলা আরবের মুশরিক সম্প্রদায়ের ওজর বন্ধ করার জন্য বলেনঃ "তোমরা হয়তো বলতে পার যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দু' সম্প্রদায়ের প্রতিই নাযিল হয়েছে, আর আমরা তো এর পঠন ও পাঠন থেকে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলাম। [আল-আনআমঃ ১৫৬]
- এ আয়াতে আহলে কিতাব তথা যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে। তাবুকে আহলে কিতাবদের সাথে মুসলিমদের যে যুদ্ধ অভিযান সংঘটিত হয়েছিল, আয়াত দুটি তারই পটভূমি। [বাগভী; ইবন কাসীর] আহলে কিতাবের উল্লেখ করে এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের সাথে যে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে, তা শুধু আহলে কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ আদেশ রয়েছে সকল কাফের সম্প্রদায়ের জন্যই। কারণ, যুদ্ধ করার যে সকল হেতু বর্ণিত হয়েছে, তা সকল কাফেরদের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং এ আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। [বাগভী; কুরতুবী; সা'দী] তবে বিশেষভাবে আহলে কিতাবের উল্লেখ করা হয়, কারণ এদের কাছে রয়েছে তাওরাত ইঞ্জীলের জ্ঞান, যে তাওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। তা সত্বেও তারা ঈমান আনছে না। [ফাতহুল কাদীর]
- এ আয়াতে যুদ্ধের চারটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে,
- প্রথমতঃ তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না।
- দ্বিতীয়তঃ আখেরাতের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই।
- তৃতীয়তঃ আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে তারা হারাম মনে করে না।
- চতুর্থতঃ সত্য দ্বীন গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক। [কুরতুবী]

ইয়াহুদী-নাসারাগণ যদিও প্রকাশ্যে আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে না, কিন্তু পরবর্তী আয়াতের বর্ণনা মতে ইয়াহুদীগণ উযায়ের আর নাসারাগণ ঈসাকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে প্রকারান্তরে শির্ক তথা অংশীবাদকেই সাব্যস্ত করছে। [বাগভী]
অনুরূপভাবে আখেরাতের প্রতি যে ঈমান রাখা দরকার তা আহলে কিতাবের অধিকাংশের মধ্যে নেই। তাদের অনেকের ধারণা হল, কিয়ামতে মানুষ দেহ নিয়ে উঠবে না; বরং তা হবে মানুষের এক ধরনের রূহানী জিন্দেগী। তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বিশেষ কোন স্থানের নাম নয়; বরং আত্মার শান্তি হল জান্নাত আর অশান্তি হল জাহান্নাম। তাদের এ বিশ্বাস কুরআনে পেশকৃত ধ্যান ধারণার বিপরীত। সুতরাং আখেরাতের প্রতি ঈমানও তাদের যথাযোগ্য নয়। তৃতীয় কারণ বলা হয়েছে যে, ইয়াহুদী-নাসারাগণ আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হারাম মনে করে না। এ কথার অর্থ হল তাওরাত ও ইঞ্জীলে যে সকল বস্তুকে হারাম করে দেয়া হয়েছে, তা তারা হারাম বলে গণ্য করে না। সেটা অনুসরণ করে না। [সা' দী]

যেমন, সুদ ও কতিপয় খাদ্যদ্রব্য- যা তাওরাত ও ইঞ্জলে হারাম ছিল, তারা সেগুলোকে হারাম মনে করত না। এ থেকে এ মাস' আলা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করা যে শুধু পাপ তা নয়, বরং কুফরীও বটে। অনুরূপ কোন হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করাও কুফরী।
চুতর্থত: তারা সত্য দ্বীনের অনুসরণ করে না। যদিও তারা মনে করে থাকে যে, তারা একটি দ্বীনের উপর আছে। কিন্তু তাদের দ্বীন সঠিক নয়। আল্লাহ সেটা কখনো অনুমোদন করেননি। অথবা এমন শরীআত যেটা আল্লাহ রহিত করেছেন। তারপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীআত দিয়ে সেটা পরিবর্তন করেছেন। সুতরাং রহিত করার পর সেটা আঁকড়ে থাকা জায়েয নয়। [সা' দী]
*** জিযইয়ার শাব্দিক অর্থঃ
বিনিময়ে প্রদত্ত পুরস্কার। [ফাতহুল কাদীর] শরীআতের পরিভাষায় জিযইয়া বলা হয় কাফেরদেরকে হত্যা থেকে মুক্তি এবং তাদেরকে মুসলিমদের মাঝে নিরাপত্তার সাথে অবস্থান করার বিনিময়ে গৃহীত সম্পদকে। যা প্রতি বছরই গ্রহণ করা হবে। ধনী, দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত প্রত্যেকে তার অবস্থানুযায়ী সেটা প্রদান করবে। যেমনটি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার পরবর্তী খলীফাগ গ্রহণ করেছিলেন। [সা' দী]
জিম্মিদেরকে ইসলামী শাসনের আওতায় যে নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ দান করা হবে তার বিনিময়কে জিযিয়া বলা হয়। তাছাড়া তারা যে হুকুম মেনে চলতে এবং ইসলামী শাসনের

আওতাধীনে বসবাস করতে রাজী হয়েছে, এটা তার একটি আলামত হিসেবেও চিহ্নিত হবে। নিজের হাতে জিযিয়া দেয় এর অর্থ হচ্ছে, সহজ, সরল আনুগত্যের ভঙ্গীতে জিযিয়া আদায় করা। আর পদানত হয়ে থাকে এর অর্থ, পৃথিবীতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের নয় বরং যে মু' মিন ও মুসলিমরা আল্লাহর খিলাফত ও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করছে তাদের হাতে থাকবে।

জিযইয়াহ্‌র তাৎপর্যঃ কুফর ও শির্ক হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। কিন্তু আল্লাহ নিজের অসীম রাহমাত গুণে শাস্তির এই কঠোরতা হ্রাস করে ঘোষণা করেন যে, তারা যদি ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত প্রজারূপে ইসলামী আইন-কানুনকে মেনে নিয়ে থাকতে চায় তবে তাদের থেকে সামান্য জিযইয়াহ কর নিয়ে মৃত্যুদন্ড থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে তাদের জান মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। শর' ঈয়াতের পরিভাষায় এটাকে জিযইয়াহ (কর) বলে।

প্রথমদিকে ইহুদী ও খ্রিষ্টানের কাছ থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নবী (সা.) নিজে মাজুসীদের (অগ্নি উপাসক) থেকে জিযিয়া আদায় করে তাদেরকে যিম্মী করেন। এরপর সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে আরবের বাইরের সব জাতির ওপর সাধারণভাবে এ আদেশ প্রয়োগ করেন।

ঊনিশ শতকে মুসলিম মিল্লাতের পতন ও অবনতির যুগে এ জিযিয়া সম্পর্কে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বড় বড় সাফাই পেশ করা হতো। সেই পদাঙ্ক অনুসারী কিছু লোক এখনো রয়েছে এবং তারা এখনো এ ব্যাপারে সাফাই গেয়ে চলেছে। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন এসবের অনেক ঊর্ধ্বে।

আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহের ভূমিকায় অবতীর্ণ, তাদের কাছে কৈফিয়ত দান ও ওযর পেশ করার তার কোন প্রয়োজন নেই। পরিষ্কার ও সোজা কথায়, যারা আল্লাহর দ্বীনকে গ্রহণ করে না এবং নিজেদের বা অন্যের উদ্ভাবিত ভুল পথে চলে, তারা বড় জোর এতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার রাখে যে, নিজেরা ভুল পথে চলতে চাইলে চলতে পারে, কিন্তু আল্লাহর যমীনে কোন একটি জায়গায়ও মানুষের ওপর শাসন চালাবার এবং নিজেদের ভ্রান্তি নীতি অনুযায়ী মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করার আদৌ কোন অধিকার তাদের নেই। দুনিয়ার যেখানেই তারা এ জিনিসটি লাভ করবে সেখানেই বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। তাদেরকে এ অবস্থান থেকে সরিয়ে দিয়ে সৎ ও সত্যনিষ্ঠা জীবন বিধানের অনুগত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোই হবে মু' মিনদের কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, এ জিযিয়া কিসের বিনিময়ে দেয়? এর জবাব হচ্ছে, ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের আওতাধিনে নিজেদের গোমরাহীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য অমুসলিমদের যে স্বাধীনতা দান করা হয় এটা তারই মূল্য। আর যে সৎ ও সত্যনিষ্ঠা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তাদের এ স্বাধীনতাকে কাজে লাগাবার অনুমতি দেয় এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে তার শাসন ও আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা পরিচালনায় এ অর্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত। এর সবচেয়ে বড় ফায়দা হচ্ছে এই যে, জিযিয়া আদায় করার সময় প্রতি বছর জিম্মিদের মধ্যে একটা অনুভূতি জাগতে থাকবে। প্রতি বছর তারা মনে করতে থাকবে, তারা আল্লাহর পথে যাকাত দেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত আর এর পরিবর্তে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাদের মূল্য দিতে হচ্ছে। এটা তাদের কত বড় দুর্ভাগ্য। এ দুর্ভাগ্যের কারাগারে তারা বন্দী।
সঠিক মত হচ্ছে যে, দু'পক্ষের সম্মতিক্রমে জিযইয়ার যে হার ধার্য হবে তাতে শরীআতের পক্ষ থেকে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ধার্যকৃত হারে জিযইয়া নেয়া হবে। যেমন, নাজরানের নাসারাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি হয় যে, তারা সকলের পক্ষ থেকে বার্ষিক দু'হাজার জোড়া বস্ত্র প্রদান করবে। [আস-সুনানুস সগীর লিল বাইহাকী]

প্রতি জোড়ায় থাকবে একটা লুঙ্গি ও একটা চাদর। প্রতি জোড়ার মূল্যও ধার্য হয়। অর্থাৎ এক উকিয়া রুপার সমমূল্য। চল্লিশ দিরহামে হয় এক উকিয়া। যা আমাদের দেশের প্রায় সাড়ে এগার তোলা রুপার সমপরিমাণ। অনুরূপ তাগলিব গোত্রীয় নাসারাদের সাথে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চুক্তি হয় যে, তারা যাকাতের নেসাবের দ্বিগুণ পরিমাণে জিযইয়া কর প্রদান করবে। [মুয়াত্তা, ইমাম মুহাম্মাদের বর্ণনায়] তাই মুসলিমগণ যদি কোন দেশ যুদ্ধ করে জয় করে নেয় এবং সে দেশের অধিবাসিগণকে তাদের সহায় সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের উপর বহাল রাখে এবং তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হিসাবে থাকতে চায়, তবে তাদের জিযিয়ার হার তা হবে যা উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আপন শাসনকালে ধার্য করেছিলেন। তাহলো উচ্চবিত্তের জন্যে মাসিক চার দিরহাম, মধ্যবিত্তের জন্যে দু' দিরহাম এবং স্বাস্থ্যবান শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিম্নবিত্তের জন্য মাত্র এক দিরহাম। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস]
বিকলাঙ্গ, মহিলা শিশু, বৃদ্ধ এবং সংসারত্যাগী ধর্মজাযক এই জিযিরা কর থেকে অব্যাহতি পায়। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস| কিন্তু এই স্বল্প পরিমাণ জিযইয়া আদায়ের বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাগিদ ছিল যে, কারো সাধ্যের বাইরে

যেন কোনরূপ জোর জবরদস্তি করা না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর যুলুম চালাবে, কিয়ামতের দিন আমি যালেমের বিরুদ্ধে ঐ অমুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করব।’’ [আবু দাউদঃ ৩০৫২]।

উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে কতিপয় ইমাম এক মত পোষণ করেন যে, শরীআত জিযইয়ার বিশেষ কোন হার নির্দিষ্ট করে দেয়নি, বরং তা ইসলামী শাসকের সুবিবেচনার উপর নির্ভরশীল। তিনি অমুসলিমদের অবস্থা পর্যালোচনা করে যা সঙ্গত মনে হয়, ধার্য করবেন। জিযইয়া প্রদানে স্বীকৃত হলে ওদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার যে আদেশ আয়াতে হয়েছে তা অধিকাংশ ইমামের মতে সকল অমুসলিমের বেলায় প্রযোজ্য। তারা আহলে কিতাব হোক বা অন্য কেউ। [কুরতুবী] আর এ জন্যই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাজুসীদের থেকেও জিযইয়া নিয়েছিলেন। [বুখারী: ৩১৫৬] Sisters’Forum In Islam.com

আলোচ্য আয়াতে يد শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ নির্ধারণ নিয়ে মতভেদ হয়েছে। স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে, নিজেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদান করা। কারও কারও মতে এর অর্থ, স্বহস্তে প্রদান করা। কারও কারও মতে, নগদ প্রদান করা, বাকী না করা। কারও কারও মতে, জোর করে নেয়া। কারও কারও মতে, এটা বুঝিয়ে নেয়া যে, তাদেরকে হত্যা না করে এ অর্থ নেয়ার দ্বারা তাদের উপর দয়া করা হচ্ছে। কার কারও মতে, ধিকৃত। [ফাতহুল কাদীর] তাই জিযইয়া যেন খয়রাতি চাঁদা প্রদানের মত না হয়, বরং তা হবে ইসলামের বিজয়কে মেনে নিয়ে একান্ত অনুগত নাগরিক হিসেবে।

() আয়াতে বলা হয়েছেঃ ‘‘যতক্ষণ না তারা বিনীত হয়ে জিযইয়া প্রদান করে’’ । এ বাক্য দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহের একটি সীমা ঠিক করে দেয়া হয়। অর্থাৎ তাবেদার প্রজারূপে জিযইয়া কর প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। [সা’ দী]

Sisters’Forum In Islam.com